মঙ্গলবার, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৬৫

বাস, মিনিবাস, ভাড়া বাড়ল, কিন্তু পরিষেবা সুনিশ্চিত নয়

পেট্রোল, ডিজেলের ক্রমাগত দাম বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সোমবার থেকে বাস, মিনিবাসের ভাড়া বাড়ল। রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত মতো বাসের ভাড়া ও মিনিবাসের ভাড়া প্রতি স্তরে ১ টাকা করে বেড়ে গেল। এছাড়া ট্যাক্সিতে উঠলে ভাড়া ধার্য হল ৩০ টাকা। এতদিন এই হার ছিল ২৫ টাকা। রাজ্যের পরিবহন দফতর ট্যাক্সি ভাড়া বৃদ্ধির কথা জানিয়েছে। তেলের দাম বাড়লে ভাড়া বাড়বে, এটা অবশ্যই সঠিক এবং যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তেলের দাম কমলে আর ভাড়া কমে না। সরকারও নীরব থাকে। কিন্তু ভাড়া বাড়লেও বাস ও মিনিবাসে যাত্রী পরিষেবা অত্যন্ত জঘন্য। বেশির ভাগ বাসের ক্ষেত্রে সিট ২২ থেকে ২৫ ইঞ্চির মধ্যে থাকে। ফলে ধারে বসা যাত্রীদের ভয়ানক কষ্ট পেতে হয়। প্রায় পড়ে যাওয়ার উপক্রম। এছাড়া বাসে যে দুটি সিট সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য বরাদ্দ তা অত্যন্ত জঘন্য, লোহার মতো শক্ত। ২ জন সিনিয়র সিটিজেনের স্বাচ্ছন্দ্যে বসার উপায় নেই। এছাড়া বেলা ১২টা থেকে ৪টে এবং রাত ৯টা থেকে ১০টা বিভিন্ন রুটে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস নির্ধারিত স্টপেজে দাঁড়ায় না। বেসরকারি বাসের যাত্রী নামার ২টি দরজার একটি দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বাসের কর্মী সংখ্যা কমাতে। আর রাত ৯টার মধ্যে প্রায় সব রুটেই মালিকরা মিনিবাস বন্ধ করে দেন। ভাড়া বাড়ল। কিন্তু যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য আরও খারাপ হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবে বলেই মানুষের আশা।

অমৃত কথা

দক্ষিণেশ্বরে
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"যতক্ষণ অহং থাকে ততক্ষণ ব্রহ্ম-জ্ঞান হলে ঈশ্বরকে দর্শন হলে, তবে অহং নিজের বশে আসে; তা না হলে অহংকে বশ করা যায় না। নিজের ছায়াকে ধরা শক্ত; তবে সূর্য মাথার উপর এলে ছায়া আধ হাতের মধ্যে থাকে।"

[বন্দ্যোপাধ্যায়কে শিক্ষা—ঈশ্বর দর্শন—উপায় সাধুসঙ্গ]

ভক্ত—ঈশ্বর দর্শন কিরূপ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—থিয়েটার-অভিনয় দেখ নাই? লোক সব পরস্পর কথা কচ্ছে, এমন সময় পর্দা উঠে গেল; তখন সকলের সমস্ত মনটা অভিনয়ে যায়; আর বাহ্যদৃষ্টি থাকে না—এরই নাম **সমাধিস্থ** হওয়া।

"আবার পর্দা পড়ে গেলে বাহিরে দৃষ্টি। মায়ারূপ যবনিকা পড়ে গেলে আবার মানুষ বহির্মুখ হয়।"

(নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি)-- "তুমি অনেক ভ্রমণ করেছে, সাধুদের কিছু গল্প কর।"

(নরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি)-"তুমি অনেক ভ্রমন করেছো, সাধুদের কিছু গল্প কর।"

বন্দ্যোপাধ্যায় ভূটানে দুইজন যোগী দেখেছিলেন , তারা আধসের নিমের রস খান; এই সব গল্প করিতেছেন। আধার নর্মদা তীরে সাধুর আশ্রমের সাধু পেন্টেলুন - পরা বাঙ্গালী বাবুকে দেখে বলেছিলেন , 'ইসকা পেটমে ছুরী হে।' শ্রীরামকৃষ্ণ -দেখ, সাধুদের ছবি রাখতে হয়; তাহলে সর্বদা ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়।

বন্দ্যোপাধ্যায়-আপনার ছবি ঘরে রেখেছি; আর পাহাড়ে সাধুর ছবি , তাতে গাজার ছবিতে আগুন লাগানো হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-হ্যাঁ ; সাধুদের দেখলে উদ্দিপন হয়; শোলার আতা দেখলে যেমন সত্যকার আতার উদ্দিপন হয়; **যুবতী স্ত্রীলোক** দেখলে লোকের যেমন ভোগের উদ্দীপন হয়।

"তাই তোমাদের বলি-**সর্বদাই সাধুসঙ্গ দরকার**।" বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি)-"সংসারে জ্বালা তো দেখছো। ভোগ নিতে গেলেই জ্বালা। চিলের মুখে যতক্ষন মাছ ছিল, ততক্ষন ঝাঁকে ঝাঁকে কাক এসে তাকে জ্বালাতন করেছিল।"

দিনপঞ্জিকা

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ, **১২ জুন,** ২৮ জেঠ , সংবৎ ১৩/১৪ জ্যৈষ্ঠ বদি অধিক, ২৭ রমজান। সূর্য্যোদয় ঘ ৪।৫৫, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।১৯। **মঙ্গলবার,** ত্রয়োদশী প্রাতঃ ঘ ৫।৪০ পরে চতুর্দশী রাত্রি ঘ ৩।৫৫ মিঃ। কৃত্তিকানক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।২৬ মিঃ। সুকর্মাযোগ দিবা ঘ ১২।১৮ মিঃ। বনিজকরণ, প্রাতঃ ঘ ৫।৪০ গতে বৃষ্টিকরণ, অপরাহ্ণ ঘ ৪।৪৭ গতে শকুনীকরণ, রাত্রি ঘ ৩।৫৫ গতে চতুস্পাদকরণ। **জন্মে**—বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ঘ ৬।২৬ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**— ত্রিপাদদোষ সন্ধ্যা ঘ ৬।২৬ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**— দক্ষিণে, প্রাতঃ ঘ ৫।৪০ গতে পশ্চিমে, রাত্রি ঘ ৩।৫৫ গতে ঈশাণে। **বারবেলাদি** ঘ ৬।৩৬ গতে ৮।১৬ মধ্যে ও ১।১৮ গতে ২।৫৮ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৩৮ গতে ৮।৫৮ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই। **শুভকর্ম**—দীক্ষা। **বিবিধ**—চতুর্দশীর একোদ্দীষ্ট ও সপিণ্ডন। প্রাতঃ ঘ ৫।৪০ গতে রাত্রি ঘ ৩।৫৫ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। **এ্যহস্পর্শ। স্নানদানে সহস্রগুণ ফল**। প্রাতঃ ঘ ৫।৪০ গতে রাত্রি ঘ ৩।৫৫ মধ্যে **পূণ্যতরা গঙ্গস্নান**। রাত্রি ঘ ৩।৫৫ গতে **গোসহস্রীযোগ গঙ্গাস্নানে সহস্র গো-দান তুল্য ফল সমফল। মুং পর্ব্ব—শাবিকদর। সর্ব্বশাস্ত্র পারমঙ্গম অখণ্ড মহাযোগী মাহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের তিরোভাব দিবস** (১২জুন, ১৯৭৬ খ্রীঃ)। **অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৭।৩৮ মধ্যে ও ৯।২৫ গতে ১২।০৬ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৭।০৫ মধ্যে ও ১২।০১ গতে ২।০৭ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**—দিবা ঘ ২।৪৮ গতে ৩।৪১ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৯ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৮।২৯ গতে ৯।৫৪ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৮ জ্যৈষ্ঠ, ভাঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ, **১২ জুন,** ২৭ রমজান, ২৮ জেঠ ,উঃ ৪।৫৪, অঃ ৬।১৭, **মঙ্গলবার,** ত্রয়োদশী প্রাতঃ ঘ ৫।৩৯ পরে চতুর্দশী রা ঘ ৩।৫৩ , সেহ্‌রী শেষ ৩।১৮, ইফতার ৬।২৬।

মহাপুরুষ শ্রী শ্রীঁ হরিদেবের তিরোভাব উৎসব (অসম)

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে,সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের চাকরি জীবন

সাত

হয়রানির বদলি

বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ

এরপর বঙ্কিমচন্দ্রকে ৭ ই ফেব্রুয়ারী ১৮৮৩ তারিখে হাওড়াতে বদলি করা হয়। সে সময় হাওড়ার জেলা শাসক ছিলেন মিষ্টার ই. ভি. ওয়েষ্টম্যাকট। রেলওয়ের একটি মকদ্দোমায় বঙ্কিমচন্দ্র অভিযুক্ত আসামীদের বেকসুর মুক্তি দেওয়ায় রুষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সোজা তাঁর এজলাসে ঢুকে পড়েন। দুজনের দীর্ঘ বাদানুবাদের পর আদালত অবমাননার দায় এড়াতে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই রায় মেনে নেন।[২৪] ১৮৮২-৮৩-র বর্ধমানের বিভাগীয় প্রশাসনিক রিপোর্টে হাওড়ার জেলা অফিসার মন্তব্য করেন, "(ইনি) একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ অফিসার। যে কাজের জন্য তিনি প্রধানত নিযুক্ত সেই বিচারের কাজে তিনি পরিশ্রম করেন। (আমাকে) পুরোপুরি সন্তুষ্ট করেছেন।" বিভাগীয় কমিশনের মন্তব্য, "দীর্ঘদিনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন একজন অফিসার।" ২০ শে নভেম্বর ১৮৮৩ থেকে তিনি তেরো দিনের প্রিভিলেজ লীভ নিয়েছিলেন।

১৮৮২-৮৩-র কোন এক সময় বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের কোথাও কর্মরত ছিলেন যা ক্যারেক্টার বুক বা চাকরির ইতিহাসে স্পষ্ট করে বলা নেই। এজন্য এই বছরে বিভাগীয় রিপোর্টে কমিশনার লিখেছেন, "খ্যাতির দিক থেকে তিনি একজন খুব ভাল অফিসার।" ঐ বছর বোর্ডের রেভিনিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন রিপোর্টে বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জীর নাম বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্ত অফিসারদের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে গৃহীত সরকারি সিদ্ধান্ত হল, "এই বছর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জীর কাজে লেফটেনেন্ট গভর্নর সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।"

এরপর একাধিক্রমে প্রায় তিন বছর বঙ্কিমচন্দ্র হাওড়াতে কর্মরত ছিলেন। ১৮৮৩-৮৪-র বর্ধমানের বিভাগীয় প্রশাসনিক রিপোর্টে কালেক্টর সাহেব মন্তব্য করেছেন, "এঁকে দিয়ে পুরো দায়িত্ব পালন করাতে হলে এর কাজের নিয়মিত তদারক করা দরকার।" কমিশনারের মন্তব্য, "আমি কালেক্টর-এর সঙ্গে সহমত পোষন করছি না। (ইনি) একজন চতুর ও অভিজ্ঞ অফিসার। যদিও কখনও কখনও একসেনটিক বা খামখেয়ালি।" পরের বছরের রিপোর্টে কালেক্টর লিখেছেন, "এর কর্মক্ষমতা সুপরিচিত। জেলাতে যখন অফিসারদের সংখ্যা কম ছিল সে সময় ফৌজদারী বিচারের কাজে ইনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।" কমিশনার-এর মন্তব্য, "যোগ্য ও দক্ষ অফিসার।" ঐ একই বছর বোর্ডের রিপোর্টেও তিনি ভাল কাজ করে প্রশাসনের সুদৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বলে মন্তব্য করা হয়েছে। ১৮৮৫-৮৬-র রিপোর্টে হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট অফিসার লিখেছেন, "আমার অধীনে কাজ করেন নি।" কমিশনার-এর মন্তব্য, "একজন অত্যন্ত কাজের অফিসার।"

হাওড়াতে থাকাকালীন ৩০ শে ডিসেম্বর ১৮৮৪ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে ফার্স্ট (প্রথম) গ্রেড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর করা হয়। ১০ ই জুন ১৮৮৫ থেকে তিনি তিনমাস প্রিভিলেজ লীভ নেন। ২৫ শে জুন ১৮৮৫ তারিখে তাঁকে ঝিনাইদহ মহকুমাতে বদলি করা হয়। শারিরীক অসুস্থতার জন্য তিনি ৮ই ডিসেম্বর ১৮৮৫ বর্ধমান বিভাগের ১৮৮৬-৮৭-র প্রশাসনিক রিপোর্টে হাওড়ার কালেক্টর মন্তব্য করেছেন, "একজন গড়পড়তা অফিসার; সরকারি কাজে আরও আগ্রহ দেখাতে পারতেন।" বিভাগীয় কমিশনার এ বছর তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র ১৮ই নভেম্বর ১৮৮৬ থেকে চোদ্দ দিন মেডিকেল লীভ নিলেন; সেই সঙ্গে ১৯ শে নভেম্বর ১৮৮৬ তারিখে ব্যক্তিগত কাজের জন্য আরও ছ'মাস ছুটি চাইলেন। অবশ্য আংশিক ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত', 'দেবী চৌধুরানী', 'ইন্দিরা', 'রাজসিংহ' ও 'রাধারাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২ই আগষ্ট ১৮৮৬ তারিখে তাঁর 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশিত হল।

১০ই মে ১৮৮৭ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুরে বদলি করা হল। ১৮৮৭-৮৮ র বর্ধমান বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রতিবেদনে কালেক্টর বললেন, "অত্যন্ত দরকারী ও যোগ্য অফিসার।" কমিশনার মি. আলেকজান্ডার লিখলেন, "(ইনি) বিচার বিভাগের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করেননি। তবে মোটামুটি ভাল একজন রেভিনিউ অফিসার।" পরবর্তী কমিশনার মি. ওয়েষ্টম্যাকট লিখলেন, "মি. লী এই অফিসার সম্বন্ধে আশাতীত ভাল রিপোর্ট দিয়েছিলেন। (কিন্তু) আমি সবসময় তাঁর কাজে উৎসাহের বড় অভাব দেখেছি।" তিনি 'ভাল' বলে তাঁর মন্তব্য শেষ করেছেন। থেকে তিনমাস সিক লীভ নেন।

১৮৮৫-৮৬ র প্রেসিডেন্সী ডিভিশনের সাধারণ প্রশাসনিক প্রতিবেদনে যশো'র-এর কালেক্টর লিখেছেন, " একজন অভিজ্ঞ অফিসার, যাঁর স্বাস্থ্য ভাল নয়। তিনি তাঁর কাজে আরও আগ্রহ দেখাতে পারতেন।" কমিশনার মিস্টার স্মিথ লিখেছেন, 'অ্যাভারেজ' বা সাধারণ মানের। তিনি আরও লিখলেন, "আগের আগের বছর বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জী যখন আমার অধীনে কাজ করতেন, তখন তাঁর সম্বন্ধে আমার একটা খুব উচ্চ ধারণা হয়েছিল; কিন্তু সম্ভবত খারাপ স্বাস্থ্যের কারণে তিনি ঝিনাইদহতে ভাল কাজ করতে পারেন নি।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য হয়রানির বদলি বন্ধ হল না। ১২ই মে ১৮৮৬ তে তাঁকে অস্থায়ী দায়িত্ব দিয়ে বালেশ্বর জেলার ভদ্রক মহকুমাতে পাঠানো হল। কয়েকদিন পর ৫ই জুন তাঁকে হাওড়ায় ফিরিয়ে আনা হল। হাওড়াতে থাকাকালীন বর্ধমান বিভাগের ১৮৮৬-৮৭-র প্রশাসনিক রিপোর্টে হাওড়ার কালেক্টর মন্তব্য করেছেন, "একজন গড়পড়তা অফিসার; সরকারি কাজে আরও আগ্রহ দেখাতে পারতেন।" বিভাগীয় কমিশনার এ বছর তাঁর সম্পর্কে কোন মন্তব্যই করলেন না।

বঙ্কিমচন্দ্র ১৮ই নভেম্বর ১৮৮৬ থেকে চোদ্দ দিন মেডিকেল লীভ নিলেন; সেই সঙ্গে ১৯ শে নভেম্বর ১৮৮৬ তারিখে ব্যক্তিগত কাজের জন্য আরও ছ'মাস ছুটি চাইলেন। অবশ্য আংশিক ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে তাঁর 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত', 'দেবী চৌধুরানী', 'ইন্দিরা', 'রাজসিংহ' ও 'রাধারাণী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। ১২ই আগষ্ট ১৮৮৬ তারিখে তাঁর 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থ প্রকাশিত হল।

১০ই মে ১৮৮৭ তারিখে বঙ্কিমচন্দ্রকে মেদিনীপুরে বদলি করা হল। ১৮৮৭-৮৮ র বর্ধমান বিভাগীয় প্রশাসনিক প্রতিবেদনে কালেক্টর বললেন, "অত্যন্ত দরকারী ও যোগ্য অফিসার।" কমিশনার মি. আলেকজান্ডার লিখলেন, "(ইনি) বিচার বিভাগের কাজ ভালভাবে সম্পন্ন করেননি। তবে মোটামুটি ভাল একজন রেভিনিউ অফিসার।" পরবর্তী কমিশনার মি. ওয়েষ্টম্যাকট লিখলেন, "মি. লী এই অফিসার সম্বন্ধে আশাতীত ভাল রিপোর্ট দিয়েছিলেন। (কিন্তু) আমি সবসময় তাঁর কাজে উৎসাহের বড় অভাব দেখেছি।" গুড বা 'ভাল' বলে তিনি তাঁর মন্তব্য শেষ করেছেন।

ক্রমশ

শ্রীমা

শ্রীশ্রীমা সারদার আধ্যাত্মিক চেতনায় অনস্যূত তদীয় তদাত্ম্যবোধ

গদাধর রানা

শেষ পর্ব

এছাড়াও আমরা জানি, নহবতে বাস করাকালীন যোগমায়ার বিশেষ ইচ্ছায় শ্রীঠাকুর যুগাবতারের অসমাপ্ত কাজের গুরুদায়িত্ব তাঁর শক্তিরূপিনী সারদাদেবীর উপর অর্পণ করতে শুরু করেছিলেন--যার ক্রমান্বয়ী লক্ষ্যস্বরূপ কাশীপুরে অবস্থানকালীন ঠাকুরের অন্তিমবেলায় তিনি শ্রীমাকে কলকাতার লোকদেরকে দেখার জন্য ভারার্পণ করতে ভুলে যাননি--শ্রীশ্রীমাও নীরবে তাতে সম্মতিও দিয়েছিলেন। এহেন পারস্পরিক মতৈক্যের মধ্যেই শ্রীমায়ের অন্তরলালিত তাদাত্ম্যবোধ কী বা ঠাকুরের প্রকট বা অপ্রকট দশাতেও ফলেফুলে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

এক্ষণে, আমরা শ্রীঠাকুরের সাথে শ্রীমায়ের এবং অন্যান্য ভক্তপ্রাণ মানুষদের সঙ্গে শ্রীমায়ের তদাত্ম্যবোধের নমুনাস্বরূপ কিছু কিছু খণ্ড ঘটনাচিত্রের অবতারণা করতেই পারি।

যেমন, শ্রীমা একদিন তাঁর অন্যতম সঙ্গিনী যোগীনমাকে অনুরোধ করেছিলেন ঠাকুরকে ব'লে ক'য়ে যাতে তাঁর (শ্রীমায়ের) একটু ভাবটাব হয় সেটুকু করিয়ে দেবার জন্য। সর্বদাই ঠাকুরের সামনে লোকজনের ভিড়ের জন্য মা ঠাকুরকে বলতে পারছিলেন না। একদিন যোগীনমা সুযোগ পেয়ে ঠাকুরের কাছে মায়ের ইচ্ছার কথাটি নিবেদন করলেন। তা শুনেও ঠাকুর নীরব গম্ভীর হয়ে রইলেন। তিনি যখন অমনি গম্ভীর হয়ে থাকতেন, তখন (তাঁর সঙ্গে) কথা বলতে কারো সাহস হতো না। তাই যোগীনমা বিষয়টিকে পরবর্তী সময়ে এভাবেই বলেছিলেন, "তাই আমি কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে তাঁকে প্রণাম করে চ'লে এলাম। নহবতে এসে দেখলাম মা পূজা করছেন। দরজা একটু খুলে দেখি মা খুব হাসছেন। এই হাসছেন আবার একটু পরেই কাঁদছেন। আমি তো দেখে দরজা বন্ধ করে চলে এলাম। অনেকক্ষণ পরে পুনরায় যেতে মা বললেন, একেই ভাব বলে? তখন আমি বললাম, 'তবে মা, তোমার নাকি ভাব হয় না?' মা তখন লজ্জা পেয়ে হাসতে লাগলেন।" এ ঘটনা থেকে আমরা কতটুকু কী অবহিত হতে পারলাম? শ্রীশ্রীঠাকুরের সদিচ্ছা বা সম্মতি না থাকলে মা তো আপন ইচ্ছাতে সমাধিস্থ হ'তে পারতেন না! এভাবেই শ্রীমা বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে ধ্যানে সমাধিস্থা হতেন—আর এই সব সমাধিস্থের মূলে তাঁর ধ্যানের লক্ষ্যই ছিল পরমব্রহ্মরূপ ঠাকুরের সত্তার সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া। আমরা জেনেছি মায়ের ভাবসমাধিকে সহজে কেউ টের পেতেন না। যদিও স্বয়ং ঠাকুর কিন্তু শত চেষ্টা করেও তাঁর ভাবসমাধিকে চেপে রাখতে পারতেন না। আমরা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করতে পারি—মায়ের অধিকাংশ সাধনাই অনুষ্ঠিত হয়েছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে। একদিন বালকভক্ত সারদা প্রসাদকে (ভাবীকালে ত্রিগুণাতিনন্দ) শ্রীঠাকুর তাঁর নিজের ঘরে বসে শেয়ারের গাড়ীভাড়া বাবাদ চারটি পয়সা নহবতের মায়ের কাছ থেকে চেয়ে নিতে বললেন। কথাটি শুধু সারদা প্রসাদকে সম্মুখে রেখে ঠাকুর বলেছিলেন। তৃতীয় আর কেউ শোনেনি। খানিক পরে বালক সারদা নহবতে ঘরের কাছে এসে দেখল যে সিঁড়ির উপরে চারটে পয়সা রাখা আছে। শ্রীমা জানতেন যে শ্রীঠাকুর ওকে ঘরে ফেরার জন্য ভাড়ার পয়সা নিতে আসার জন্য বলবেন--সেজন্য আগেই ওটা রেখে দিতেন। মা'র মনপ্রাণ ও সমস্ত ইন্দ্রিয় শ্রীঠাকুরের কাছেই ঘুরে বেড়াত। শ্রীমা জনৈক ভক্তকে একদিন বলেছিলেন, "তাঁর ঘরে কী হচ্ছে, তিনি কাকে কী বলছেন, তার সব আমি নহবতে বসেই জানতে শুনতে পেতুম।" তাদাত্ম্যবোধের কী অতুলনীয় উদাহরণ!

ঠাকুর একবার কালীঘর থেকে মাতালের মতো টলতে টলতে এসে মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ওগো আমি কি মদ খয়েছি? আমি কি মাতাল, তবে টলছি কেন?" শ্রীমা বললেন "নানা তুমি মদ খাবে কেন? তুমি মা কালীর ভাবামৃত খেয়েছ। ঠাকুর উত্তর শুনে খুব খুশি হয়েই বললেন "তুমি ঠিক বলেছ।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থা তৎক্ষণাৎ উপলব্ধি করা থেকেই বোঝা যায় --শ্রীমায়ের মনও কত উচ্চভাবে অবস্থান করতো।

যোগীনমা দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলপাতা নিয়ে গিয়ে শুক্‌নো বেলপাতা দিয়েও কখনও কখনও শিবপূজা করতেন। একদিন শ্রীমা যোগীনমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মা যোগীন তুমি শুক্‌নো বেলপাতায় পূজো কর কি?" যোগীন বললে, "তুমি জানলে মা কী করে?" মা বললেন, "আজ আমি সকালে ধ্যান করার সময় দেখতে পেলুম যে তুমি শুক্‌নো বেলপাতায় পুজো করছো।" কী অদ্ভুত দৈবীশক্তি মায়ের! একেই বলে স্বতঃলব্ধ জ্ঞান বা স্বজ্ঞান।

একবার পানিহাটির চিঁড়ে উৎসবে ঠাকুরের সাথে শ্রীমা যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কয়েকজন স্ত্রীভক্ত অবশ্যই ঠাকুরের সঙ্গে যাচ্ছিলেন। শ্রীমার মনের কথাটি স্ত্রীভক্তরা ঠাকুরের সমক্ষে নিবেদন করার পরে তিনি বলেন, "তোমরা তো যাচ্ছ, যদি ওর ইচ্ছা হয় তো চলুক।" শ্রীমা তৎক্ষণাৎই বুঝে নিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মতি নাই। অতএব না যাওয়াই তিনি স্থির করলেন। মায়ের ঐ নীরব সিদ্ধান্ত ঠাকুরের কাছে খুশির কারণই হয়েছিল। ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ও সঙ্গে না যেয়ে ভালই করেছে। লোকে বলতো হংস হংসী এসেছে। ও খুব বুদ্ধিমতী।" কী অনুপম উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক আধ্যাত্মবোধ। কোনো মন কচাকচি নাই, কোনো ভুল বোঝাবুঝি নেই, কারও কোনো অসন্তোষও নাই।

একদা প্রিয় সঙ্গিনী গৌরী মাকে মায়ের কাছে সেবিকা হিসাবে পৌঁছে দিয়ে ঠাকুর মা'র সমর্থনে মায়ের আত্মবোধের ইজেলে নিজেকে একাত্ম করে দিয়েছিলেন। এই হচ্ছেন ঠাকুর আর ঠাকুরাণী শ্রীমা আমাদের।

দক্ষিণেশ্বরের ঝাড়ুদার বণিক মেথর একবার মা'র কাছে বাবার কৃপা প্রার্থনা করেছে। পরবর্তী সময়ে মা সারদার শ্রীমুখ থেকে রসিকের নিবেদনটি ঠাকুর বাস্তবিকই শুনেছিলেন। একদিন পঞ্চবটীতে রসিককে কাছে ডেকে তাকে আলিঙ্গন করে ঠাকুর হয়েছিলেন সমাধিস্থ। শোনা যায়, রসিককে কৃপা করা তো কষ্টই, মায়েরও ইচ্ছানুসারে রসিকের প্রতি তার অন্তিম সময়ে ঠাকুর কৃপা করেছিলেন।

বাগবাজার অঞ্চলে কালীপদ ঘোষ নামে সাহেব কোম্পানীর বড়বাবু ছিলেন। লোকে তাকে দানাকালী বলতো। তিনি কুসঙ্গে পড়ে কুকার্যে রত হয়ে তাঁর পারিবারিক জীবন বিষময় করে তুলেছিলেন। তাঁর স্ত্রী ঠাকুরের নাম শুনে একদিন কাঁদতে কাঁদতে দক্ষিণেশ্বরে এসে স্বামীর মন পরিবর্তনের জন্য কোনও মন্ত্র বা ঔষধের প্রার্থনা করলেন। ঘোষপত্নীর কাতরতায় শ্রীঠাকুরের মনে দয়ার উদ্রেক হলো। তিনি বিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে নহবত দেখিয়ে বললেন, "ওখানে একজন স্ত্রীলোক আছেন; তাঁকে তুমি সব খুলে বল, তিনি ঠিক ঠিক ওষুধ দেবেন। তাঁর বিবিধ মহৌষধী জানা আছে। এসব ব্যাপারে তাঁর শক্তি আমরা চেয়ে অনেক বেশি।" শ্রীমা পূজার আয়োজন করছেন—এমন সময় ঘোষগৃহিনী উপস্থিত হলেন শ্রীমাসারদদেবীর কাছে। নারীর বেদনা তিনি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করলেন মায়ের কাছে। শ্রীমা সব শুনে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, "আমি তার কী জানি বাছা। যিনি তোমায় পাঠিয়েছেন, তিনি নানারকমের ঔষধ জানেন। তুমি তাঁর কাছেই যাও।" বিপন্না নারী তাঁর কাছে ফিরে যেতে শ্রীঠাকুর নিজে কিছু না করে পুনঃরায় ঐ স্ত্রীলোককে নহবতেই পাঠালেন। এভাবে দুতিনবার ঘোরার পর করুণাময়ী শ্রীমা বুঝতে পারলেন--শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা তাঁর শক্তি শ্রীমা সারদাদেবীর মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক্। তিনি ঐ অর্পিতা নারীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করে পূজার একটি বিল্বপত্র তার হাতে দিয়ে করুণস্বরে বললেন, "বাছা, এটি নিয়ে যাও। এতেই তোমার বাসনা পূর্ণ হবে।" যথাকালে শ্রীমায়ের অমোঘ আশীর্বাদ সফল হয়েছিল। অচিরেই কালীপদ ঘোষের জীবন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছিল। এই ঘটনাটিতে আমরা বুঝতে পারি --শ্রীমা অন্তরে অন্তরে ঠাকুরের ইচ্ছাশক্তিকে নিজের কাছে কতটা আত্মসাৎ করতে পেরে তাদাত্ম্যবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন! যাই বা হোক্ ঐ ঘটনা অবলম্বনে শ্রীমায়ের কৃপাহস্তও উন্মোচিত হয়েছিল। শ্রীমা কর্ত্তৃক ভক্তদের মধ্যে ঢালাও খাদ্যদ্রব্য ও ফলমূল দান ধ্যানের জন্য ঠাকুর বিরক্ত হতেন--এটা শ্রীমাও জানতেন, কিন্তু মুখে কিছু বলতেন না। অথচ, শ্রীমার মনোকষ্ট ঠাকুর বুঝতে পারতেন। কী অভাবনীয় আধ্যাত্মবোধ পরস্পরে! ঠাকুরের প্রাণঢালা গাওয়া গানের প্রতি ছিল মায়ের সে কী দরদ—এটিও তো মায়ের আধ্যাত্মবোধের স্মরণযোগ্য নমুনা। একদা একজন নষ্ট মেয়েকে মা সঙ্গ দিয়েছেন বলে ঠাকুর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটি মাতৃজ্ঞানেই মার কাছে আসে—মায়ের এই যে মমতা ঠাকুরের হৃদয়ে তা পৌঁছেছিল, ঠাকুর বুঝেছিলেন, পরে আর কিছু বলেননি। মা বুঝলেন, একই সঙ্গে ঠাকুরেরও মমত্ববোধের উদ্রেক হয়েছিল। শ্রীমা তাঁর ভাবী ভরণপোষণের জন্য কোনও পাকা ব্যবস্থা মনে মনে প্রত্যাশা করতেন। ঠাকুর বুঝতে পেরে তাঁর মাসোহারার ব্যবস্থা আগেই করে দিয়েছিলেন। দেখা গেল--মা যা চাইলেন নীরবে, ঠাকুর আপন হতেই তা সম্পূর্ণ করে রেখেছিলেন।

এই ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা এই দুটি আত্মার মধ্যে এবং মার সাথে অন্যান্য ভক্তের আত্মার মিলনের অনুকূলেও মায়ের অতুলনীয় তাদাত্ম্যবোধের পরিচয় পেয়ে ধন্য হই। আমরা সাধারণ ভক্তপ্রাণ যারা তাঁরা ওঁদের সার্বিক জীবন চর্চা মধ্যে থেকে কী অসাধারণ শিক্ষা লাভ করে সমৃদ্ধ হতে পারি--তা ভাষায় নয়, একমাত্র অনুভবের আধারেই ধরা পড়ে।

সম্পাদক সমীপেষু

রাজপুর সোনারপুরের মা বিপদতারিণী

তিনি সর্বদাই আমাদের বিপদ থেকে রক্ষা করে আসছেন। তিনিই সংসারের হালটা ধরে আছেন। আমরা তাই তাঁকে মা বিপদতারিণী বলে পুজো করি। মায়ের মন্দিরটি রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার অধীনে, এখানে এলে মন সত্যিই পবিত্র হয়। এখানের মন্দিরটিও বিশাল। সেই মন্দিরেই অধিষ্ঠিতা মা বিপদতারিণী। পুরো মন্দির জুড়ে আরো দেব-দেবীর মূর্তি। একতার প্রতীক হিসাবে রয়েছে বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ, কবীর, গুরুনানকদের মতো মণীষীদের মূর্তি। যা দেখার পর খুবই ভালো লাগবে। প্রথমে এখানে এসে প্রসাদের জন্য ফুল, মালা, মিষ্টি, ধূপ, বাতি কিনে নিতে হয়। তারপর মূল মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। সিঁড়ি বেয়ে একতলায় এসে আপনার ফুল, মালা, মিষ্টি, ধূপ, বাতি জমা দিয়ে দিতে হবে। সামনেই বসার জায়গা। এরপর অঞ্জলির মন্ত্রপাঠ করাবেন পুরোহিত মহাশয়। অঞ্জলি শেষ হয়ে গেলে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। এরপর আস্তে আস্তে পৌঁছে যাবেন মায়ের কাছে। অঞ্জলি দেওয়া ফুলটা মায়ের পায়ে দিতে পারবেন এবং পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করতে পারবেন। দক্ষিণা আপনার মনের মতো দিতে পারবেন। ধূপ আর মোমবাতি নিয়ে চলে আসতে হবে বেলতলায়, সেখানে এসে ধূপ ও বাতি জ্বালাতে হবে এবং মনের বাসনাটিকেও মায়ের কাছে জানাবেন। আবার বেলতলায় এসেও জানাতে পারেন। একটা সুন্দর পরিবেশের মধ্যে মা রয়েছেন, মা বিপদতারিণীর রূপ নিয়ে। এখানে আসতে গেলে, হাওড়া বা কলকাতা থেকে মেট্রো ধরে গড়িয়া চলে আসুন। সেখান থেকে অটো ধরে পৌঁছে যাওয়া যায় মায়ের মন্দিরে। সকাল ৬.৩০ মিঃ থেকে ১১.৩০ পর্যন্ত পুজো হয়। আবার ২.৩০মিনিটে দ্বিতীয়বার পুজো আরম্ভ হয়। তিনিই তো বিপদ থেকে রক্ষা করে এসেছেন। তাই তার দর্শনে চলে আসুন না একবার, ভালো লাগবে।

প্রবীর মিত্র,
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়